বাংলা নাটকে গানের ক্রমবিকাশ

পল্লব মুখোপাধ্যায়

নাটকের নাচ ও গান একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, বৈঠকী গানের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। নাটকের নাচ ও গান চরিত্র ও পরিবেশের স্ফূরণ ঘটায়। সুতরাং সঙ্গীতের মাধ্যমে যাতে নাটকের চরিত্র ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থানকে অর্থময় করে তোলে, একথা মাথায় রেখে সুর সংযোজন করা হতো এবং দশ বারো পাতার সংলাপের পরিবর্ত্তে একখানা গানই যথেষ্ট মনে হতো। গানগুলির সুর সাধারণত রাগ রাগিণীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠত, এই রাগ রাগিনীকে সময়ের নিরিখে ভাগ করার বিজ্ঞান সম্মত বিধান নির্ধারণ করে গেছেন আমাদের পূর্বতন গুণী শিল্পীরা।

সেই অনুসারে কোন চরিত্র কোন সময়ে গান গাইছেন, কোন কোন পরিস্থিতির মধ্যে গাইছেন সেইভাবে নানা অঙ্ক কষে সুর সৃষ্টি করা হয়ে থাকতো এবং নৃত্য ও নাট্যের ভাব অনুযায়ী তার অঙ্গ-ভঙ্গি, মুদ্রা ও দৃষ্টি সঞ্চালন সেই ভাবেই শেখানো হতো। তারই প্রভাবে নাটকটি সম্পূর্ণ অর্থবহ হয়ে উঠতে সক্ষম হতো।

প্রথমত রঙ্গালয় স্থাপিত হওয়ার আগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত নাটক শৌখিন থিয়েটারে অভিনীত হতো তাতে গানের প্রভাব ছিল না। যদি কোন কারণে গানের প্রয়োজন হতো সুগায়ক অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাবে নেপথ্যেই গান গাওয়ানো হয়ে থাকতো।

১৮৭২ সালের থেকে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত মোটামুটিভাবে এই সময়টাকে আমরা নাটকের ইতিহাসের আদি যুগ বলে ধরে নিতে পারি। এরও আগের কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপীয় থিয়েটার চোখে দেখে এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের নাটকাদি পড়ে বাঙ্গালীর মনে সেই সময়ে নাট্য প্রযোজনার ইচ্ছা হয়। পাঁচালী, কবিগান, যাত্রা এগুলি সবই বাঙ্গালীর নিজস্ব জিনিস হলেও সঠিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য ধরণের থিয়েটার করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু এইসব ইংরাজী ভাষার নাটক অভিনয়ে ভাষাগত অসুবিধার কারণে দর্শক সমাজে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্বভাবতই সকলের বোধগম্য হওয়ার মতই নাটক লেখার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়।

১৮৩৫ সালে ৬ই অক্টোবর বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় প্রথম বাংলা নাটক ভারতচন্দ্রের আখ্যান অবলম্বনে বিদ্যাসুন্দর নাটকটি শ্যামবাজারের নবীন চন্দ্রের বাড়ীতে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় অভিনীত হয় এবং নেপথ্যে সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজানো হয়, তৎকালীন ব্রাহ্মণের এই যন্ত্রগুলি বাজিয়েছেন এবং নাটকে কিছু কানেরও প্রয়োগ করা হয়।

ষোড়শী রাধামণি একই সঙ্গে দুটি চরিত্রে অভিনয় ও গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। বাংলা যাত্রাও এই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৪৯ সালে 'নন্দ বিদায়' নামে এক নতুন ধরণের যাত্রার সূত্রপাত হয়। জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীরাম চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সুরে টপ্পা ও কীর্তনের প্রভাবগুলি দর্শক সমাজে এক বিরাট আলোড়ন তোলে। ১৯ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সবদিক দিয়ে নবচেতনার উন্মেষ হয়, বিপ্লবী নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর কুলীন সবস্ব নাটকের মাধ্যমে বহু বিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে সারা দেশব্যাপী এক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

সেই সময়ে শৌখিন নাট্য চর্চা শুরু হয় ১৮৫৮ সালে। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী রূপচাঁদ পক্ষী এই নাটকে সুরারোপ করেন এবং ''অধমেরে গুণমণী পড়েছে কি মনে' গানখানি লোকের মুখে মুখে ফিরতো।

এই সময়ের মাঝামাঝি বেলগাছিয়া নাট্যশালা, বাংলাদেশে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়, এই মঞ্চে প্রথম অভিনয় হয় শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকটি। এই নাটকটি রামানারায়ণ তর্করত্নের বাংলা অনুবাদ, এই রঙ্গলয়েই প্রথম প্রচলিত হয় ঐকতান বাদন। ক্ষেত্রমোহন — গোস্বামী এবং যদুনাথ পাল নামে দুইজন বাদ্যযন্ত্র শিল্পী সুর সংযোগ করেন, ও বেশ কয়েকবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

এই নাটকে কিছু অসংগতি থাকায় ক্ষুব্ধ মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাটক লেখার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং তারই ফলে সৃষ্টি হয় শর্মিষ্ঠা নাটকের। ১৮৫৯ সলে ৩রা সেপ্টেম্বর শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় শুরু হয়। এই নাটকের উদ্বোধন সঙ্গীত (নটির গান) মাইকেলের লেখা, গানটি গীত হয় বাহার রাগে ও জলদ তেতালা তালে। শর্মিষ্ঠার ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রখ্যাত সংগীত বিশারদ ও সুগায়ক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দৃশ্যটি ছিলো শর্মিষ্ঠা বীণা বাজিয়ে গান করবেন, কিন্তু বীণা বাজাতে সক্ষম না হওয়ায় তিনি মঞ্চে শুধু বীণার উপর আঙ্গুল চালিয়ে যেতেন আর নেপথ্যে একজন বাদক বীণাটি বাজিয়ে যেতেন, এই প্রথম বাদ্য যন্ত্রের প্লেব্যাক।

১৮৬০ সালে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গালয়ে বিদ্যাসুন্দর নাটকটি আবার নূতন করে মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটকের সঙ্গীতের দায়িত্বে ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন মহাশয়। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় সংগীতে পারদশী ছিলেন। এই নাটকের সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব দেশীয় যন্ত্রই ব্যবহার করেছেন যেমন বীণা, সেতার, তম্বুরা, ঢোলক, মন্দিরা, করতাল, কাঁসি, নূপুর, মোহনবাঁশী, শঙ্খ। এছাড়া তিনি একটি বিশেষ ভূমিকাতে অভিনয় করেছেন, তাঁর এই নাট্যভাবনার মূলে ছিলো জাতীয়তাবোধ সঙ্গীত ও নাটকের মাধ্যমে বাঙ্গালীর হিন্দু ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসার।

প্রসঙ্গত বলে রাখি এই সমস্ত নাট্য প্রয়াসের উদ্যোক্তা এবং পৃষ্ঠাপোষক ছিলেন প্রধানত বিদগ্ধ ও বিত্তশালী ব্যক্তিরাই। পরবর্তী সময়ে গিরিশ চন্দ্র ঘোষের মধ্যস্থতায় শুরু হয় ন্যাশানাল থিয়েটার, এই সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী সঙ্গীত বহুল নটাকে ৭টি গান ছিল, 'আগে যদি জানতাম কপাল আমার' এই গানটি (পিলু রাগে যৎ তালে গাওয়া) সাধারণ লোকের মুখে মুখে ফিরতো। আর একটি গানে মনোহর শাহী সুর বসিয়ে পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত

হয়েছিলেন, গানটি এইরকম, ''কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই।'' দীনবন্ধু মিত্রের পর এলেন মনমোহন বসু যিনি বাংলা নাট্যধারাকে এক নতুন খাতে তদানীন্তন পাশ্চাত্য নাট্যদর্শে রচিত নাটকের সেতুবন্ধনকারী। তিনি আধুনিক নাটকের অধিক সংখ্যক গান সংযোগ করেছিলেন। মনমোহন মন প্রাণে বিশ্বাস করতেন গান ছাড়া বাংলা নাটক হতে পারে না।

১৮৬৭ তে জাতীয় নবজাগরণের সময় এলেন একজন জাতীয়তাবাদী মানুষ। গোপাল উড়ের যাত্রায় অনুপ্রানিত হয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর শক্তিশালী নাট্যকার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, এবং জোড়াসাঁকোর থিয়েটারের অভিনীত 'নব' নাটক নামে রামনারায়ণ রচিত একটি বহুবিবাহ বিষয়ক সামাজিক নাটকে নটীর ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। অভিনয়ের সময় তিনি নিজে হারমোনিয়াম বাজাতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত নাট্যাবলীর মধ্যে তাঁর স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।

১৮৭৭ সালে শারদীয়া উপলক্ষে তিনি লিখেছিলেন ''আগমনী'' নামে একটি নাটক, তার মুখ্য চরিত্র চারটি। গিরিরাজ, মেনকা, শিব, উমা, পার্শ্ব চরিত্র রূপে নন্দী ভৃঙ্গী যোগিনীগণ, গায়ক গায়িকা। প্রথমে মঙ্গলাচরণ তারপর তিনটি দৃশ্য। তেরখানি গানের সমাবেশ ঘটেছে এই নাটকে। গানগুলি একক, দ্বৈত বা সমবেত ভাবে। এই গীতি নাট্যের মধুর আবেগময় সঙ্গীত দৃশ্যের মধ্য দিয়ে জননীর অন্তরে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা এমন ভাবে রূপায়িত হয়েছিল যে, দর্শক সমাজ তাঁকে সাগ্রহে, সানন্দে অভিনন্দিত করে।

সে সময়ে নাটক লেখার পরে পরিস্থিতি অনুযায়ী নাট্যকার বা গীতিকার সেই সুরে গান রচনা করতেন, শুধুমাত্র দীনবন্ধু, রামনারায়ণ, মাইকেল এঁদের ছাপা নাটকে, গানে শব্দ যা আছে তাই থাকতো, এতে সুরকারদের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতো। এরপর গিরিশ যুগে নাটকে অত্যন্ত অভাব দেখে গিরিশচন্দ্র নিজেই নাটক লিখতে শুরু করেন। নাটকের সংলাপ লেখা হয়ে যাওয়ার পর সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য রামতারণ সান্যাল মহাশয় সর্বপ্রথম গিরিশচন্দ্রকে বলেন, ইচ্ছামতো গান লিখতে পারো। তিনি তাতে গানের ভাব ও নাটকের ঘটনা অনুযায়ী সুর সংযোগ করেন। এই নতুন পদ্ধতি রামতারণের অক্ষয় কীর্তি বলে মনে করা হয়। গিরিশচন্দ্রের প্রায় সব নাটকের সুরে প্রয়োগ কর্তা তিনিই ছিলেন।

তখনকার নাটক অভিনয় হতো দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে কাজেই দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সময় মঞ্চে যে শূন্যতা দেখা দিতো সখীদের নাচ, গান দিয়ে তা পূর্ণ করা হতো, তাতে নাটকের এই গুরুগম্ভীর ভাব থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকবৃন্দ একটু হালকা বোধ করতেন।

গিরিশচন্দ্রের গানে সবরকম সুরের প্রাধান্য ছিলো, রাগধর্মী, খেমটা ব্রহ্মসঙ্গীত, ভজন, কীর্তনসহ বিভিন্ন তালেরও প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে ২/৪ ছন্দের দাদরা তাল তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। গিরিশ যুগের নাট্যধারায় তাঁর গানের আর একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেছে, অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্রের খুবই কাছের মানুষ, বন্ধু ও শিষ্য ছিলেন, এক অর্থে দুজন দুজনের পরিপূরক বলে মানা হতো। তাঁকে হাস্যরস শ্রেষ্ঠ বা রসরাজ বলা হতো। তাঁর নাটকে ও থিয়েটারের একটি নূতন দিক উন্মোচিত হলো। দর্শকবৃন্দ খুঁজে পেলো এক অনাবিল আনন্দের জগৎ, সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাস্যরস মিশ্রিত বিদ্রূপাত্মক গান দর্শক মহল এক অন্যরসের আস্বাদনে বিভোর হয়ে রইলেন। সে গানের ভাষা ও সুরের বৈচিত্র্যগুলি ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে মেলবন্ধনে অপরূপ সঙ্গীতরূপে পরিগনিত হলো।

গানের কথাতে আমরা পাই- ''আমরা এবার বিলাত গিয়ে বেচব দই,'' কিম্বা, ''সখী বিধিমত রীতিমত হও শোকাকুল'', 'খাসদখল' নাটক এই ধরনের ১৫টি গানে সমৃদ্ধ ছিল। তৎকালীন ইংরাজী ভাবনার অতি শিক্ষিত মানুষের বিরুদ্ধে লেখা এই গানগুলির কথা অনুযায়ী যথার্থ সুর দিয়েছিলেন রামতারণ সান্যাল মহাশয়। পৃথিবীর পরিবর্তনে যেমন দিন বদলায়, ঠিক সেইভাবে প্রতি মুহূর্তে বদলে যায় নাটকের গতিবিধি।

গিরিশ যুগ, শিশিরযুগ পার হয়ে পৌঁছে যাই আর এক স্বর্ণযুগে তখন নাটক আর শুধু আনন্দের শিল্প নয়, একেবারে মানুষের জীবনে অন্তঃস্থলে ঢুকে পড়ে। শুরু হয় নাট্য আন্দোলনের আর এক অধ্যায়। পরিবর্তন হয় দৃশ্যপট, অভিনয়ের ধারা গীত, নৃত্য আবহসঙ্গীত, আলো, রূপসজ্জা প্রভৃতি উপকরণ সহ সবই।

মনে পড়ে যায় বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ''নবান্নের'' কথা সম্ভবত ১৯৪৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রথম অভিনয়। বদলে গেল নাটকের পটভূমি, বদলে গেল গানের ব্যবহা, মঞ্চ পরিকল্পনা। আর দর্শকদের মনোরঞ্জন নয়, শুরু হল বেঁচে থাকার লড়াইয়ের উল্লাস, হাটে-মাঠে-ঘাটে নাটকের এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পালা। আসলে বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষে মানুষের আর্থিক দুর্গতি, জীবনের মূল্যবোধের উপর সঙ্গীতে মানুষের জীবন জীবিকার পরিবর্তনের সঙ্গে নাটকের বিষয়বস্তু সহ সবকিছুর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হল। কারণ নাটক যে জীবন চর্যার দর্শন। লোকসঙ্গীতের সুর, কীর্তনের সুর, আগেও নাটকে ছিল কিন্তু এখন তার ব্যবহার হতে লাগল মানুষের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের জন্য। নিরঞ্জন দাওয়ায় শুয়ে গান ধরে, ''বড় জ্বালা বিষম জ্বালা পুড়ে পুড়ে হবো সোনা'' এ গান আগের এ গান জীবন সংগ্রামের গান, এই গান শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গান, এ গান নুয়ে পড়া মানুষকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবার গান। 'দেবী গর্জন' নাটকে কৃষকেরা যখন সংগ্রামী হয়ে ওঠে, গলায় তাদের গান উঠে আসে, 'মা' কে আনতে চলরে ক্ষীর নদি কুলে'' দর্শকদের চেতনাবোধের উন্মেষ ঘটে। 'মরাচাঁদ' নাটক কীর্ত্তনীয়ার গল্প, তাই কীর্ত্তন আছে কিন্তু শেষে যখন মর্মভেদ করে গান উঠে আসে বাঁচব বাঁচব রে আমরা/ বাঁচব রে বাঁচব/ ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়ে নয়া বাংলা গড়ব, তখন নাটকের সবকিছু বলা হয়ে যায়। তুলসী লাহিড়ী ছিলেন বৈঠকী গানের রাজত্বের লোক কিন্তু ''ছেড়া তাঁর'' বা অন্য নাটকে তিনি লৌকিক সুর প্রয়োগে নাটককে জীবন্ত করে তোলেন। শুধু মঞ্চসজ্জায় গ্রাম বা সংলাপে নয়, সুর যেন নাটকের কংক্রিটের পথ থেকে

গ্রামের আলপথে নিয়ে গেলেন। ব্রেখটের 'গ্যালিলিও' নাটকে বহুরূপীর পরিচালক শম্ভু মিত্র শিল্পীদের পুরোভাগে ছিলেন, নাটকের কার্নিভাল দৃশ্যটি খুব জরুরী, অন্তত ব্রেখট নিজে তাই মনে করেন। কিন্তু ঐ নক্ষত্র খচিত শিল্পীদের অভিনয়েও দৃশ্যটি বাদ দেওয়া হলো, এমন কি প্রতি দৃশ্যের সূচনায় কোরাসও বাদ দেওয়া হল, শুধু একবার নেপথ্যে একদম শেষে একটি গান রাখা হল। বহুরূপী প্রযোজনায় ঐ দৃশ্যের কাজ শুধু ছড়া দিয়েই করা হল। অক্ষমতাই অনেক সময় গানকে কমিয়ে আনে পরিচালকের এই আক্ষেপ থেকেই স্পষ্টই বোঝা যায় সত্য নাটকের ক্ষেত্রে গানের প্রয়োজন কতখানি।

আগেকার নাটকে ব্যঙ্গ করা ছিল সরাসরি, এখনকার নাটকে শ্লেষ, বিদ্রুপ আসে তির্যক ভঙ্গিতে।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকের গানে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তাঁর পরিকল্পিত নাচ ও গানে, নাটকে অন্য মাত্রা যুক্ত হয়, 'তিন পয়সার পালা', 'ভালমানুষ' -এর গানে অমোঘ প্রতিক্রিয়া কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ব্রেখটের নাটকে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তুলনাহীন। অন্যরকম গানের ভাষা, বৈচিত্র্যহীন সুর, প্রয়োগ নৈপুণ্যের গুণে এক অনন্য সাধারণ রূপ নেয়। 'চেষ্টা করলে হাঙ্গরের দাঁত দেখতে পাবে— কিন্তু যখন মহীন বাবুর ছুরিটা চমকাবে/ তখন দেখতে পাবে না পাবে না'। এখানেও তাঁর একটা বিশেষ চিন্তাধারা কাজ করছে।

নাটক শুরুর প্রথমে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মূল গায়ক সহ পাঁচ, ছয়জন যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীসহ এই গান গাওয়া হতো। এই গানের কথাতেই নাটকের সারমর্ম বুঝিয়ে দেওয়া হতো। এর সুরটি ছিল পাঁচালী ধর্মী, এও এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস। 'আমার মতে পেট পুরে খাও/পেট পুরে খাও/ ভালো করে ঘুম দাও রে বাবা, ভালো করে ঘুম দাও (তানা)। 'প্রেম করেছি বিয়ে করব/ পেট গরমে ধাত, বিয়ের গান, মোহিনী মোহন দেব আর মোহিনী বালা দেবী/ পুরুত মশায় মন্ত্র পড়ান অং বং চং কং। কিম্বা 'ভালোমানুষে'-এ নাচ সহ আট ঘোড়ার গান, বরের গান 'শহী-সংবাদ' - এ সিপাহীদের গান নাট্যজগতে যে নজির সৃষ্টি করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর নাটকের সব গানই বিভিন্ন রাজ্যের লোক সঙ্গীত কীর্ত্তন, খেমটা, টপ্পা, পাঁচালী, কবিগান থেকে সংগ্রহ করা। এই সুর গুলির কথার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে নাটকের প্রয়োজন অনুসারে নিজের মত করে বসিয়েছে।

তাঁর পরিচালনায় আর একটি নাটকের গানের কথা, বলতে না পারলে সঠিকভাবে তাঁর নাটকের গানকে মূল্যায়ন একেবারেই অসম্ভব। তিনি নাটকের গান মঞ্চে গাওয়াকেই বেশী প্রাধান্য দিলেও 'পাপপূণ্য' নাটকে তাঁর সুরে 'একদিন যাব বন্ধু' গানটি টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে, কখনও কণ্ঠে, কখনও দোতারার সুরে এমন নিপুনভাবে প্রয়োগ করেছেন তা সত্যই অবিস্মরনীয়। গানটি সম্ভবত পূর্ববঙ্গের সারিগন থেকে নেওয়া। গানটি শুনলে আজও আমাদের মনের মধ্যে মোচড় দেওয়া। রূপকারের প্রযোজনা 'ব্যাপিকা বিদায় নাটকে পরিচালক সবিতাব্রত দত্ত তাঁর দরজা গলায় পুরানো গানগুলি নতুন ঢঙে যেভাবে পরিবেশন করলেন, আজও মানুষের মনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

শ্যামল ঘোষের 'লম্বকর্ণ' - এর পালায় একটি গান ছিলো, 'রাত্রি আন্দাজ সোয়া একটা/ রায় বাহাদুর বংশলোচন ঘুমোচ্ছেন' সুত্রধরে মতো তিনজন মঞ্চে নাটকের পটভূমি বিশ্লেষণ করে কনও রাগ সঙ্গীত, কখনও কীর্ত্তন, কখনও মহালয়ার মন্ত্রের মতন করে গাওয়ানো হয়েছে। এই গান নাটকে এক অন্যমাত্রা যুক্ত হয়েছে। থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাটকের কথাই ধরা যাক!" নরক গুলজার" নাটকের গানে, 'কথা বলো না, শব্দ করো না' গানটির মাঝে সুরকার বিকৃত গলায় ব্যঙ্গাত্মক কতগুলি সুরের মাধ্যমে গানটিকে এক নাটকীয় করে তোলে।

গিরিশচন্দ্রের 'আবু হোলেন' যখন পঙ্কজ মুন্সী নতুনভাবে করলেন তখন আধুনিক আবুহোলেন বলেছে, ''আমার বাবা মরে ছিলো হার্টের রোগে, আমি সেই চান্স নিচ্ছি না।" আবু হোসেনকে ঘুমন্ত অবস্থায় হারুণ অল রসিদের প্রাসাদে নিয়ে আসা হয়। প্রথমে যে বৈতালিক দল গান গায়, সেই গানের সুর সকালবেলার শিক্ষার্থীদের গলা সাধার মতো। আবু চোখ মেলে ভাবে স্বপ্ন দেখছে। দুজন প্রহরী মুরগীর ডাক ডেকে ওঠে, সখীরা গান ধরে চলে কীর্ত্তনের সুরে, তারপর আবুহোলেন যখন বুঝল এ স্বপ্ন নয় সত্যি তখন প্রহরী ও সখীরা সমস্বরে টাইম সিগন্যালের সুরে গেয়ে উঠল, 'জেগেছে জেগেছে জাহাঁপান জেগেছে, এমন কি তানপুরার শব্দটিকেও কথায় রূপান্তরিত করা হলো। এইভাবে সারে জাঁহা সে আচ্ছা বা রামধূনের প্যারডি করে প্রত্যাশিত ব্যঙ্গকে আরও তীব্র করা হয়।

নাট্য জগতের এই বিচিত্র রূপরেখা সমস্ত শিল্পীদের সমন্বয়কে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভাবনার দিকে নিয়ে যায়। তাঁদের এই উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা আমরা উদ্দীপ্ত হই প্রভাবিত হই এটাই আমাদের বিরাট পাওয়া।

তথ্য সংগ্রহ - বাংলা থিয়েটারের গান গীতা সেন

থার্ড বেল - দেবাশিস দাসগুপ্ত